সমকাল

তারিখ ... 29 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

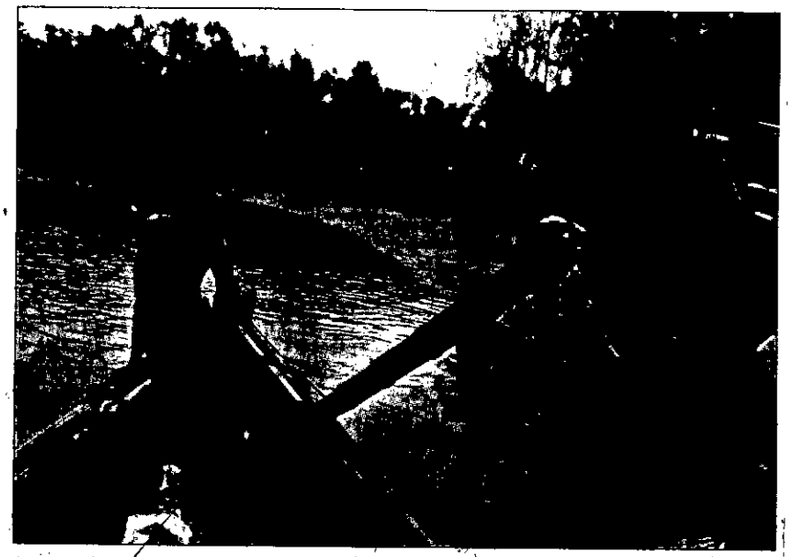

যে বয়সে যাওয়ার কথা স্কুলে সেই বয়সেই হাতিয়ার চরাঞ্চলের এই শিশুরা ধরেছে নৌকার হাল ■ সমকাল

যে চরের একটি শিশুও স্কুলে যায় না!

■ জাহিদুর রহমান, *হাতিয়া (নোয়াখালী) থেকে ফিরে*

'ঈশ্বর থাকেন ঐ ভদ্র পল্লীতে, এইখানে তাহাকে খুঁজিয়াও পাওয়া যাইবে না'– মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের এই লাইনটি প্রযোজ্য নোয়াখালীর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হাতিয়ার তিনটি চরের জন্য। এ তিন চরের মানুষ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন ঈশ্বরকে, মানবতাকে। উত্তাল মেঘনার ছোবলে ঘরবাড়ি হারিয়ে চরে আশ্রয় নেওয়া এসব মানুষের সব অধিকারই অধরা। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যেন ভিন্ন রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্রে নেই কোনো সুবিধা। মৌলিক চাহিদার প্রায় সবক'টি উপাদান থেকেই এ অঞ্চলের মানুষ রয়েছেন যোজন-যোজন দূরে। শুধু আছে মেঘনা নদীর নোনা জল, জোয়ার-ভাটা, হতাশা আর কষ্টের দিনলিপি। এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও চরের শিশুরা যায় না স্কুলে। এমনকি স্কুল কী জিনিস সেটাও জানে না তারা।

হাতিয়া উপজেলা থেকে পশ্চিম দিকে জেগে ওঠা বিচ্ছিন্ন তিনটি চর– ঘাসিয়ার চর, ঢালচর ও মৌলভীর চর। তিনটি চরের আয়তন ৮০ বর্গকিলোমিটার। ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

যে চরের একটি শিশুও স্কুলে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

লোকসংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। ঢালচর ১৯৬০ সাল থেকে হাতিয়ার অংশ। নোয়াখালী জেলা প্রশাসন ১৯৬০ সালে হাতিয়ার এক হাজার ১৫৩টি ভূমিহীন পরিবার এবং ২০০২ সালে এক হাজার ২০০টি ভূমিহীন পরিবারকে ঢালচরের খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়। সেই থেকে এখানে মানুষ আশ্রয় নিতে শুরু করেন। হাতিয়া সদর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ৫০ বছর আগে জেগে ওঠা ঘাসিয়ার চরের হাজার হাজার একর জমি এতদিন ছিল বিরানভূমি। ধান চাষ ও গরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়া চরানো ছাড়া আর কোনো কাজে ব্যবহার হতো না এই চর। কয়েক বছর ধরে সেখানেও মানুষের বসতি শুরু হয়েছে। মৌলভীর চরে ভূমিহীন আর ভাঙনকবলিত এলাকার মানুষ বনদস্যুদের কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে জমি কিনে বসবাস শুরু করেছেন।

তিন চরেই নেই কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা যেন এখানে দূর আকাশের তারা। উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা কমিউনিটি ক্লিনিক নেই, সাইক্লোন শেল্টার নেই। বিশুদ্ধ পানি পানের জন্য টিউবওয়েলও নেই। নিরাপত্তার জন্য নেই কোনো পুলিশ ফাঁড়ি। জেলা ও উপজেলা শহরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য কোনো সি-ট্রাক নেই, নেই রাস্তা। বর্ষার সময় পুরো চর ডুবে থাকে পানিতে। পোহাতে হয় সীমাহীন দুর্ভোগ।

সেখানকার মানুষ কৃষিকাজ, মৎস্য আহরণ ও পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় তারা মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। ইচ্ছা করলেই জেলা শহর বা উপজেলা শহরে যেতে পারেন না।

তিনটি চরের মানুষ বয়ারচর প্রশাসনিক ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত। ইউপি চেয়ারম্যানের কাছ থেকে একটি সনদ পেতে হলে তাদের ১০ কিলোমিটার মেঘনা নদী পাড়ি দিতে হয়। তাছাড়া এ চরের শেষ সীমানা থেকে বয়ারচরের দূরত্ব ৭০ থেকে ৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত। এ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তাদের বয়ারচরে যেতে হয়, যা ঝুঁকিপূর্ণ, ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্য। আবহাওয়া প্রতিকূল থাকলে সেখানে যাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। স্থানীয়রা জানান, ঘাসিয়ার চরে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হলে এখানকার মানুষ সরকারের সুযোগ-সুবিধা কিছুটা হলেও পেতেন। এখানে কোনো বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নেই।

হাতিয়া সদর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ৫০ বছর আগে জেগে ওঠা ঘাসিয়ার চরে সবচেয়ে বেশি মানুষ বাস করেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্পের কাজ চলছে। কাজ শেষ হলে আরও তিন হাজার পরিবার সেখানে পুনর্বাসিত হবে। বর্তমানে ঘাসিয়ার চরে প্রায় ২০ হাজার মানুষ বাস করছেন।

তিনটি চরেই শুধু খড়ের ছাউনি দিয়ে তৈরি ঝুপড়ি ঘর। এখানকার ৯০ শতাংশ মানুষের মূল পেশা নদীতে মাছ ধরা। এসব জেলের জীবন দাদনের বেড়াজালে বাঁধা। কেউ কেউ দাদনের টাকা শোধ করতে গিয়ে হয়ে পড়েন সর্বস্বান্ত। নৌকা, জালসহ মাছ ধরার খরচ জোগাতে তাদের প্রায় সবাইকে মহাজনের কাছ থেকে ধার করতে হয়। যখন মাছ মেলে না, তখন কেউ কেউ টাকা নেন পরিবার চালাতে। বিনিময়ে যতদিন না এই দাদন শোধ হয়, ততদিনই তাদের ধরা মাছের কমপক্ষে ১০ ভাগ দিতে হয় মহাজনকে। বাকি মাছও বিক্রি করতে হয় তার কাছেই বেঁধে দেওয়া দামে।

ঘাসিয়ার চর, ঢালচর ও মৌলভীর চর ঘুরে জানা গেছে, চরে বসতি স্থাপন থেকে আজ পর্যন্ত এখানকার কেউ স্কুলে গেছে এমন ঘটনা কারও জানা নেই। সরেজমিন ঘাসিয়ার চর গেলে সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে চারদিক থেকে ছুটে আসে অসংখ্য শিশু। ওরা আছে জোয়ারের অপেক্ষায়। জোয়ার এলেই চিংড়ি শিকারে নেমে পড়বে। আপাতত ওরা গরুর রাখাল। চিংড়ি ধরা আর চরে ছেড়ে দেওয়া গরু-ছাগলগুলো দেখেশুনে রাখার দায়িত্ব চেপেছে ওদের ওপর। এসব বাসিন্দার এ ছাড়া নেই অন্য কোনো ভুবন।

চরের মফিজ মাঝির ছেলে মাহফুজ (১০)। নদীতে মাছ ধরতে বাবাকে সহায়তা করে। স্কুলে কেন যেতে হয়, সেটা ওর ভাবনায় আসে না। এ বিষয়ে কিছুই বলতে পারল না। জেলে সোলেমান হোসেনের ছেলে সুমন (৭), আনিসুর রহমানের ছেলে রিয়াজ (৮), আলাউদ্দীনের মেয়ে রাবেয়া (৮), আবদুল আলীমের ছেলে রকিব (১২) কখনও স্কুলের চেহারা দেখেনি, বই হাতে নেয়নি।

ভরদুপুরে মৌলভীর চরের দুই শিশু জামাল উদ্দিন ও জসিম উদ্দিন ছুটছিল নদীতে মাছ ধরতে। বাবা জয়নাল আবদীন যাচ্ছেন আরেকটি বড় জাল নিয়ে। 'তোমরা স্কুলে যাও?'– এমন প্রশ্ন করতেই দুই শিশু অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কিছুই বলতে পারল না। ওদের বাবা বললেন, 'পুরো চরে কোনো স্কুল নেই। স্কুল থাকলে অন্তত নাম লেখা জানত।'

ডালচরের বাসিন্দা মুকিম উদ্দীনের ছেলে মুকুল হাসান (১৬), মালিহা বেগম (৮), মারুফ হোসেন (৬) কখনোই স্কুলে যায়নি। স্কুল কী, স্কুলে কী হয়, সে সম্পর্কে এই শিশুদের কোনো ধারণাই নেই। কাউকে ওরা কখনও স্কুলে যেতে দেখেনি।

সরেজমিন তিনটি চর ঘুরে দেখা যায়, এখানে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষই নিজের নাম লিখতে জানেন না। কোনো কাজে প্রয়োজন হলে টিপসই তাদের একমাত্র ভরসা।

এখানে শৈশব ডানা মেলে অপুষ্টি আর অশিক্ষায়। দুরন্তপনার রেশ কাটতে না কাটতেই হয় কর্মজীবনের সূচনা। কাঁধে ভর করে সংসারের বোঝা। ১৪-১৫ বছর পার না হতেই মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে। ছেলেদেরও বিয়ে হচ্ছে ১৭-১৮ বছরের মধ্যে।

চরের বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব সেরাজুল হক মাঝি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, জীবনে অনেক কিছু দেখলাম। কিন্তু চরের পরিবর্তন দেখলাম না। দেশে এত কিছু হয়; কিন্তু এই চরে কিছুই হয় না।

তিন চরের মানুষের দুর্গতি নিয়ে কথা হয় হাতিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান মো. মাহবুব মোর্শেদ লিটনের সঙ্গে। তিনি শোনালেন আশার কথা। বললেন, বিচ্ছিন্ন এলাকা হওয়ায় এসব চরে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, এটা সত্য। এখানকার মানুষ সুবিধাবঞ্চিত। তবে কিছু দিনের মধ্যে তিনটি চরের অবস্থা অনেকটা পাল্টে যাবে। ঘাসিয়ার চরের আশ্রয়ণ প্রকল্পের কাজ পুরোদমে চলছে। এটি বাস্তবায়িত হলে প্রায় ২০ হাজার মানুষের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে। এখানে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠনেরও চেষ্টা চলছে। এতে ঢালচর ও মৌলভীর চরের মানুষ সেবা পাবেন।

হাতিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু হাসনাত মোহাম্মদ আইনুদ্দিন বলেন, প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পের আওতায় ঘাসিয়ার চরে খুব শিগগির একটি প্রশাসনিক ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হবে। এতে ঢালচর ও মৌলভীর চরের মানুষকে আর ১০ কিলোমিটার নদী পাড়ি দিয়ে সেবা নিতে হবে না।

হাতিয়া উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আনিছুর রহমান বলেন, তিনটি চরেই স্কুল না থাকায় শিক্ষাবঞ্চিত অন্তত ২০ হাজার শিশু। সরকারের প্রশাসনিক কোনো কার্যক্রম না থাকা কিংবা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এখানে শিক্ষার আলো পৌঁছেনি। এ ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানানো হবে।